https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ ও সমকালীন অর্থনৈতিক ভোগবাদ

Achintya Ghosh[1]

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

আধুনিক সভ্যতার দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— বিজ্ঞানের আশ্রয় ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চরম ভোগবিলাসিতা। এর প্রভাবে ভবিষ্যৎ সুখ চরিতার্থে সমর্থ এমন সকল শিক্ষা অতিরিক্ত কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের বৌদ্ধিক পরিশ্রমে নিস্পৃহতা এবং অনাগ্রহ দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তির উজ্জ্বলতায় মানুষের চেতনা এমনভাবে ধাঁধিয়ে রয়েছে যে, সে তার জীবনের সীমারেখা ও সীমিত সামর্থ বিষয়ে ভাবতে চায় না। আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বিলাসবহুল গাড়ি, অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন, ব্র্যান্ডেড পোশাক— এই সবকিছুই আধুনিক মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার বিজ্ঞাপন আমাদের বোঝায় যে, আরেকটু বেশি ভোগ করলেই আমরা সুখী হতে পারব। বিস্মৃতপ্রায় সসীম মানুষ কেবলই অসীম পার্থিব সুখ সন্ধানে মত্ত। মানুষের এরূপ সুখ সন্ধান প্রবৃত্তি ও জীবনমুখী মাত্রাতিরিক্ত কাম-ভোগ, বাসনা-লোলুপ জীবনযাত্রাকে কেউ কেউ সংক্ষেপে “ভোগবাদী জীবনচর্যা” বলে বর্ণনা করেছেন। এই ভোগবাদ সাধারণত অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য ভোগ-সংস্কৃতির বিশ্বায়নের মাধ্যমে অর্জিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু কোনো দার্শনিক ধারা কি এর চেয়েও প্রাচীন? মানুষের এই বস্তুকেন্দ্রিক জীবনের কি কোনো আদি উৎস আছে? আধুনিক কালের ভোগবাদী চিন্তার এই চরম রূপ কি হঠাৎ করেই তৈরি হয়েছে, নাকি এর বাহক রূপে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার ইতিহাস কাজ করছে?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাচীন ভারতের মাটিতে, যেখানে চার্বাক দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। এই দর্শন কর্মফল ও পরলোকতত্ত্বকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে জ্ঞান লাভের একমাত্র সঠিক উপায় বলে দাবি করেছিল। চার্বাক দর্শন ছিল ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লবী চিন্তাধারা, যা প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। চার্বাক দর্শনের মূলমন্ত্র ছিল- ইহলোক ছাড়া আর কোনো লোক নেই, ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই দার্শনিক ভিত্তি কি আধুনিক ভোগবাদের সাথে হুবহু মিলে যায়? আমরা কি বলতে পারি যে, আজকের ভোগবাদী সমাজ চার্বাক দর্শনেরই একটি আধুনিক সংস্করণ?

এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক ভোগবাদের উপর চার্বাক জড়বাদের এই সুপ্ত অথচ গভীর প্রভাবকে পর্যালোচনা করে কীভাবে একটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক প্রসারের মাধ্যমে আবার বিশ্বসভ্যতার মূল স্রোতে ফিরে এসেছে।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে জড়বাদী (materialistic) দৃষ্টি অতি প্রাচীন কাল থেকেই বহমান ছিল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে ঋষি উদ্দালক আরুণির আখ্যানে জড়বাদী চিন্তার প্রাথমিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত

1 SACT-I, Narajole Raj College

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.197-202
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP. 197-202
Received on 25th February, 2026 & Accepted on 27th February, 2026, Published: 28th February, 2026

কেশকম্বলীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টরূপে জড়বাদী ছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক রচনায় অজিতের পরিচয় উচ্ছেদবাদী, দেহাত্মবাদী ও ভূতবাদীরূপে পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদ (চেতনাবিশিষ্ট দেহ-ই আত্মা) ও ভূতবাদ (চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে জাগতিক বস্তুসমূহ গঠিত) হল ভারতীয় জড়বাদের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। অজিতের উত্তরকালবর্তী আরও কয়েকজন জড়বাদী ভারতীয় দার্শনিকের পরিচয় বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকের রচনায় পাওয়া যায় - কম্বলাশ্বতর, পুরন্দর, ভাবিবিস্ত, অবিদ্ধকর্ণ, উদ্ভট ভট্ট। পয়াসি ও জবালি অজিতের পূর্ববর্তী প্রাচীন দুই জড়বাদী চিন্তাবিদ ছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। চার্বাক দর্শনের কোনও প্রামাণ্য এখনও পর্যন্ত অপ্রাপ্ত। ফলে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালে চার্বাক নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনিই এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকেই এই মত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ বলে বলেন 'চার্বাক' নামটি এসেছে 'চর্ব' ধাতু থেকে। 'চর্ব' ধাতুটির অর্থ হল 'চর্বন করা' বা 'খাওয়া'। এই দর্শন 'খাওয়া-দাওয়া'কেই চরম লক্ষ্য বা চরম আদর্শ বলে মনে করে। তাই এই দর্শনকে 'চার্বাক' বলা হয়। এই ব্যাখ্যাও অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও কোনও মতে চার্বাক শব্দটি গঠিত হয়েছে চারু + বাক্ শব্দের সমন্বয়ে। 'চারু' শব্দের অর্থ হল মধুর বা মিষ্টি এবং 'বাক' শব্দের অর্থ হল কথা। চার্বাক শব্দের অর্থ হল 'মধুর কথা' বা 'মিষ্টি কথা'। এই দর্শনের কথাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে 'মধুর' বা শ্রুতিমধুর ছিল। তাই এই দর্শনের নাম 'চার্বাক দর্শন'। চার্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসতে পারলেও চার্বাক দর্শন যে বেদে বর্ণিত আধ্যাত্মবাদের বিরোধী জড়বাদী দর্শন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য না থাকলেও, অনুমান করা হয় যে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই দর্শনের বিকাশ ঘটে। এই সময়কাল ছিল ভারতীয় দর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি ঘটে এবং বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চার্বাক দর্শন ছিল এই প্রতিক্রিয়ার একটি চরম রূপ, যা কেবল বৈদিক ধর্মকেই নয়, বরং অপ্রত্যক্ষযোগ্য আধ্যাত্মিক ধারণা ও ধর্মীয় বিশ্বাসকেই অস্বীকার করেছিল।

চার্বাক দর্শনের ভিত্তি হলো তার জ্ঞানতত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনে সাধারণত চারটি প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎস স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) এবং শব্দ (Verbal Testimony)। কিন্তু চার্বাক দর্শন শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাদের মতে, আমরা যা সরাসরি দেখতে পাই, শুনতে পাই, ছুঁতে পাই, তা-ই সত্য। বাকি সবকিছু অনুমান মাত্র, যা ভ্রান্ত হতে পারে। এই জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতেই চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য ধারা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জগৎ, যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এই জ্ঞানতত্ত্বই পরবর্তীতে ভোগবাদী জীবনযাত্রার দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

চার্বাক অধিবিদ্যা সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। তাদের মতে, এই জগতে যা কিছু আছে, সবকিছুই চারটি ভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) সমন্বয়ে গঠিত। চেতনাও এই ভূতসমূহের একটি বিশেষ সমন্বয়ের ফল। যেমন — মদ তৈরি করতে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ প্রয়োজন, তেমনই দেহে বিভিন্ন ভূতের মিলনে চেতনার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর এই ভূতসমূহ পুনরায় তাদের নিজ নিজ উৎসে বিলীন হয়ে যায় এবং চেতনারও বিলয় ঘটে। সুতরাং, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। এই অধিবিদ্যার ভিত্তিতে চার্বাক দর্শন ঈশ্বর, আত্মা, পুনর্জন্ম, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের মতে, এগুলি পুরোহিত ও ধর্মগুরুদের তৈরি করা প্রতারণা, যার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। ইহলোকই একমাত্র লোক, তাই ইহলোকেই সুখে থাকার চেষ্টা করা উচিত। চার্বাক দর্শনের এই বস্তুবাদী অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বৈপ্লবিক ছিল। বৈদিক ধর্মের জটিল আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞবাদ, ব্রাহ্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে এটি ছিল এক জোরালো প্রতিবাদ।

চার্বাক নীতিশাস্ত্রের পারিভাষিক নাম হলো সুখবাদ (Hedonism)। তাদের মতে, জীবনের লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করা এবং দুঃখ এড়িয়ে চলা। এই আনন্দ কেবল ইন্দ্রিয়গত — ভালো খাবার, আরামদায়ক জীবন, নারীসঙ্গ ইত্যাদি। চার্বাক দার্শনিকদের বিখ্যাত উক্তি হলো: **"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"** ও

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

“ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ”। অর্থাৎ, যতদিন বাঁচা যায়, সুখে বাঁচা উচিত। ঘি খাওয়া এবং জীবন উপভোগ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই, পরলৌকিক আত্মাও নেই। ব্রাহ্মণদের ধর্মও কিছু নয়, আর নাস্তিকরা কোনো দোষী নয়। চার্বাক দর্শন এই সুখবাদকে চরম অর্থে গ্রহণ করে। তাদের মতে, ভবিষ্যতের জন্য আজকের সুখ বিসর্জন দেওয়া বোকামি। আগুনের শিখায় এক ফোঁটা ঘি ঢালার চেয়ে বরং সেই ঘি দিয়ে ভাত খাওয়াই ভালো। স্বর্গের মিথ্যা আশায় কষ্ট স্বীকার না করে বর্তমানেই সুখ উপভোগ করা উচিত। এই নীতিশাস্ত্রই হলো চার্বাক দর্শনের কেন্দ্রীয় বক্তব্য এবং এই কারণেই এটি আধুনিক ভোগবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ভোগবাদ বলতে আমরা সাধারণত সেই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে বুঝি, যা মানুষকে ক্রমাগতভাবে পণ্য, সেবা ক্রয় ও ভোগ করতে উৎসাহিত করে। এই ব্যবস্থায় ভোগকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয় এবং মানুষের সুখ-দুঃখ মূল্যায়ন করা হয় তার ভোগের পরিমাণ দিয়ে। ভোগবাদী সমাজে মানুষ তার পরিচয় খুঁজে পায় সে কী ভোগ করে, তার কী কী জিনিস আছে, সেগুলির মাধ্যমে। শিল্প বিপ্লবের ফলে পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বিংশ শতকে বিশ্বায়নের ফলে ভোগবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নেতৃত্বে যে ভোগ-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বকে গ্রাস করে। তবে ভোগবাদের এই ইতিহাস সম্পূর্ণ নয়। যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে, ভোগবাদের দার্শনিক ভিত্তি আরও প্রাচীন। পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন ও ভোগের প্রযুক্তিগত সুযোগ আধুনিক কালের হলেও, মানুষের মনে এই ধারণা যে "ভোগই জীবন" তা হাজার হাজার বছরের পুরনো। আর এই ধারণার প্রথম সুস্পষ্ট ও পদ্ধতিগত রূপ আমরা পাই চার্বাক দর্শনে।

বস্তুগত উন্নয়নকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে দেখা: আধুনিক সমাজে মানুষের সাফল্য মূল্যায়ন করা হয় তার আয়, সম্পত্তি, ভোগ্যপণ্যের সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে। কে কত বড় গাড়ি চালায়, কার কত বড় বাড়ি, কার মোবাইল কত অত্যাধুনিক — এগুলিই হয়ে উঠেছে মানুষের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। আধুনিক ভোগবাদে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অপরিসীম। বিজ্ঞাপন মানুষের মনে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে এবং বোঝায় যে, এই পণ্যটি কিনলেই আপনি সুখী হবেন, সমাজে সম্মান পাবেন, আকর্ষণীয় হবেন। বিজ্ঞাপন আমাদের স্বপ্ন বিক্রি করে, আর আমরা সেই স্বপ্নের বিনিময়ে টাকা দিই। আধুনিক শিল্পে পণ্যের আয়ুষ্কাল কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখা হয়, যাতে মানুষ দ্রুত নতুন পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। মোবাইল ফোনের মডেল প্রতি বছর বদলানো, ফ্যাশনের দ্রুত পরিবর্তন—এসবই পরিকল্পিত অপ্রচলতার উদাহরণ। অতিরিক্ত ভোগের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবী আজ ভোগবাদের হুমকির সম্মুখীন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, অতিরিক্ত ভোগ মানুষকে সুখী করছে না বরং আরও অসন্তুষ্ট করছে। নতুন জিনিস পাওয়ার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর তারপর আবার নতুনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই চিরন্তন অসন্তোষ মানুষকে মানসিক চাপে ফেলে দিচ্ছে।

ভোগবাদ ও পুঁজিবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান ভোগ বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদের মূল কথা হলো মুনাফা অর্জন, আর মুনাফা অর্জন সম্ভব তখনই, যখন মানুষ ক্রমাগত পণ্য কিনতে থাকবে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সব সময় মানুষের মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে অফুরন্ত করে তোলা হয়। মানুষকে শেখানো হয় যে, সে যতই পাক না কেন, তার আরও বেশি প্রয়োজন। এই "আরও বেশি" - এর মনোভাবই হলো ভোগবাদের মূল চালিকাশক্তি। আর এই মনোভাব কিন্তু নতুন নয়। চার্বাক দর্শনেও আমরা এই "আরও বেশি" - এর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখি, যদিও সেখানে তা দার্শনিক স্তরে ছিল, অর্থনৈতিক স্তরে নয়।

চার্বাক দর্শন ও আধুনিক ভোগবাদের মধ্যে প্রাত সাদৃশ্য হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তরে। চার্বাক দর্শন যেমন প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করে, আধুনিক ভোগবাদী সমাজও তেমনই বস্তুজগতকেই একমাত্র বাস্তবতা বলে গ্রহণ করে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে (Empirical Data) সর্বোচ্চ স্থান দেয়। যা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য নয়, তাকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা পদ্ধতি, এমনকি দৈনন্দিন

জীবনেও আমরা দেখি যে, যা দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না। ভালোবাসা, ত্যাগ, করুণা—এগুলি পরিমাপ করা যায় না বলে এগুলিকে আমরা প্রায়ই 'অবাস্তব' বা 'আদর্শবাদী' বলে উড়িয়ে দিই। বরং আমরা গুরুত্ব দিই টাকার অঙ্কে, পণ্যের সংখ্যায়, জিডিপি-র হার ইত্যাদিতে। এটি চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদেরই সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলন। চার্বাক যেমন প্রত্যক্ষের অযোগ্য জগতকে অবিশ্বাস করত, আধুনিক মানুষও তেমনই ধর্ম, অলৌকিকতা, নৈতিক মূল্যবোধ — যা সরাসরি দেখা যায় না — সেগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখে। বাস্তববাদী (Realistic) হওয়ার নামে আমরা ধীরে ধীরে চার্বাকপন্থী হয়ে উঠছে।

অধিবিদ্যার স্তরেও চার্বাক দর্শন ও আধুনিক ভোগবাদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। চার্বাক যেমন দেহাতিরিক্ত আত্মা, পুনর্জন্ম, পরকালকে অস্বীকার করেছে, আধুনিক ভোগবাদী মানুষও তেমনই ইহলোককেই একমাত্র বাস্তবতা বলে মনে করে। আজকের মানুষের কাছে মৃত্যুর পর কী হবে, সেই চিন্তা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। জীবনের সীমা মৃত্যু পর্যন্তই, তাই মৃত্যুর আগে যত বেশি সম্ভব ভোগ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি চার্বাক দর্শনের "যদি জীবৎ" নীতির আধুনিক সংস্করণ। চার্বাক যেমন বলত, "যতদিন বাঁচো, সুখে বাঁচো", আধুনিক মানুষও তেমনই বলে, "একবার জীবন পেয়েছি, তাই জীবনটা উপভোগ করে নাও (YOLO - You Only Live Once)"। এই YOLO সংস্কৃতি আজকের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খুব জনপ্রিয়, আর এটি চার্বাক দর্শনেরই একটি আধুনিক রূপ। আত্মা ও পরকালের অবিশ্বাস মানুষকে বর্তমান মুহূর্তে আটকে রাখে। যদি এই জীবনই শেষ হয়, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার কোনো মানে হয় না। চার্বাক যেমন যজ্ঞে ঘি ঢালার চেয়ে ভাতে ঘি খাওয়াকে শ্রেয় বলে মনে করত, আধুনিক মানুষও তেমনই পেনশনের চেয়ে এখনকার বিলাসিতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

নীতিশাস্ত্রের স্তরে সাদৃশ্য সবচেয়ে প্রকট। চার্বাক নীতিশাস্ত্র ছিল সুখবাদ, আর আধুনিক ভোগবাদের নীতিশাস্ত্রও সুখবাদ। উভয়ের মতে, জীবনের লক্ষ্য হলো আনন্দ লাভ করা। এই আনন্দ মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বস্তুগত। আধুনিক অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো চাহিদা সৃষ্টি ও ভোগ বৃদ্ধি। বিজ্ঞাপন ও বিপণন কৌশল মানুষকে ক্রমাগত নতুন পণ্য ভোগ করতে উৎসাহিত করে। সুখকে পরিমাপ করা হয় আয়, ভোগ্য পণ্য ও বিলাসিতার মাধ্যমে। টাকার অঙ্কে যার জীবন যত বড়, সে তত সুখী—এই ধারণা আজ সর্বস্বীকৃত। এটি চার্বাকের সুখবাদী নীতিশাস্ত্রেরই চরম বিকাশ, যেখানে "ভোগই জীবন" (Consumption is life) এই বার্তা প্রচারিত হয়। চার্বাক যেমন নারীসঙ্গ, মদ, মাংস ইত্যাদিকে ভোগের উপকরণ হিসেবে দেখত, আধুনিক ভোগবাদও তেমনই মানুষের সব আকাঙ্ক্ষাকে পণ্যে পরিণত করেছে। মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে পণ্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিক্রি বাড়ানো হয়। এটিও চার্বাক চিন্তারই একটি রূপ। চার্বাক যেমন ধর্ম ও ত্যাগকে অস্বীকার করেছিল, আধুনিক ভোগবাদও তেমনই ত্যাগ ও সংযমের বিরোধী। আজকের পৃথিবীতে 'বেশি' পাওয়াকেই সাফল্য বলে মনে করা হয়, 'কমে' সন্তুষ্ট থাকাকে দুর্বলতা। এই 'অধিক'-এর সংস্কৃতি চার্বাকেরই দান।

প্রাচীন ও নব্য ভেদে চার্বাক দর্শনের দুটি শাখা ছিল। প্রাচীন চার্বাকরা চরম জড়বাদী মত পোষণ করতেন, যেখানে তারা সব ধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে অস্বীকার করতেন। কিন্তু নব্য-চার্বাকরা কিছুটা উদার ছিলেন। তারা বৌদ্ধিক আলোকের বিচারে যে কোনো কিছুর মূল্য ও গ্রাহ্য-ত্যাজ্যত্ব নির্ণয়ের উপদেশ দিয়েছেন। ফলে প্রাচীনপন্থী জড়বাদীদের বর্জিত বহু বিষয় নব্যবাদীদের দার্শনিকতত্ত্বে গৃহীত হয়েছে। ঠিক একই বিবর্তন আমরা আধুনিক ভোগবাদেও দেখি। প্রাথমিক ভোগবাদ ছিল চরম ও সীমালঙ্ঘনকারী। কিন্তু এখনকার ভোগবাদ আরও পরিশীলিত। এখন 'স্পিরিচুয়ালিটি'ও একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। যোগ, ধ্যান, আধ্যাত্মিক গুরু — এসব এখন বাজারজাত করা হয়। মানুষ টাকা দিয়ে যোগ ক্লাসে যায়, ধ্যান শেখে, আধ্যাত্মিক বই কেনে। এভাবে ভোগবাদ সবকিছুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, এমনকি আধ্যাত্মিকতাকেও। নব্য-চার্বাক যেমন প্রাচীন চরমপন্থা কিছুটা শিথিল করেছিল, আধুনিক ভোগবাদও তেমনই তার চরমপন্থা কিছুটা লাঘব করেছে। এখন শুধু মদ ও নারীর কথাই বলা হয় না, বরং সুস্বাদু খাবার, বিলাসবহুল গাড়ি, ব্র্যান্ডেড পোশাক, আরামদায়ক আবাসন, এমনকি সুস্থ জীবনযাপন — এই সবকিছু মিলিয়ে ভোগের সংজ্ঞা বিস্তৃত হয়েছে।

এখন আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির সম্মুখীন—আধুনিক ভোগবাদ কি সত্যিই চার্বাক দর্শনের সরাসরি প্রভাব, নাকি এটি মানব সভ্যতার একটি সমান্তরাল ও স্বাধীন বিকাশ? এই প্রশ্নের উত্তর জটিল এবং একমুখী নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদের উত্থান মূলত ইউরোপের অভ্যন্তরীণ কারণ, যেমন — বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য, ঔপনিবেশিক সম্পদ লুণ্ঠন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট কর্ম নীতির (Protestant Work Ethic) ফল। সরাসরি প্রমাণ পাওয়া কঠিন যে, স্মরণকালের কোনো ইউরোপীয় চিন্তাবিদ চার্বাক সূত্র পড়ে শিল্প কারখানা স্থাপন করেছিলেন। আধুনিক ভোগবাদের মূল চালিকাশক্তি অর্থনৈতিক, দার্শনিক নয়।

অন্যদিকে, চার্বাক দর্শন মূলত একটি নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ, অর্থনৈতিক নীতি নয়। এটি মানুষকে ভোগের দার্শনিক যুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু ভোগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেনি। সেই অর্থে, চার্বাক ভোগবাদের তত্ত্ব দিয়েছিল, আর আধুনিক পুঁজিবাদ সেই তত্ত্বকে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা দিয়েছে। তবুও, এই প্রভাব অস্বীকার করা যায় না যে, মানব চিন্তার একটি সার্বজনীন ধারা হিসেবে বস্তুবাদ (Materialism) সর্বত্রই বিদ্যমান। চার্বাক ছিল সেই ধারার ভারতীয় প্রকাশ। যখন ইউরোপে রেনেসাঁর পর বস্তুবাদ জোরালো হয়, তখন তারা নিজস্ব প্রাচীন গ্রিক দর্শন (যেমন: ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস) থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, যা ভারতীয় চার্বাকের সাথে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই সাদৃশ্য থেকেই বোধহয় ভারতীয় সভ্যতাকে "সকল সভ্যতার জননী" বলার প্রবণতা তৈরি হয়। এখানে "জননী" বলতে সরাসরি মাতৃত্ব নয়, বরং ভাবনার উৎস হিসেবে বোঝানো হয়। বিভিন্ন ধারা — আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদী উভয় প্রকার — ভারতীয় ভূমিতেই প্রথম বিকশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়ে।

চার্বাক দর্শন ও আধুনিক ভোগবাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। প্রথমত, চার্বাক দর্শন ছিল একটি নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ, যা ব্যক্তির সুখ ও মুক্তির কথা বলত। অন্যদিকে, আধুনিক ভোগবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা পুঁজির সঞ্চয় ও মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়ত, চার্বাক দর্শন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। এটি সাধারণ মানুষের দর্শন ছিল (লোকায়ত)। অন্যদিকে, আধুনিক ভোগবাদ বৃহৎ কর্পোরেশন ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত সুখের জন্য নয়। তৃতীয়ত, চার্বাক দর্শন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সুখের কথা বললেও, তা সীমিত পরিসরে ছিল। আধুনিক ভোগবাদ অসীম ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে, যা ব্যক্তিকে কখনোই প্রকৃত তৃপ্তি দেয় না, বরং তাকে একটি দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে রাখে। চতুর্থত, চার্বাক দর্শন কখনোই পরিবেশ ধ্বংসের পক্ষে কথা বলেনি, কারণ তখন পরিবেশ ধ্বংসের প্রশ্নই ওঠেনি। আধুনিক ভোগবাদ পরিবেশের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে ফেলছে।

পাশ্চাত্য জীবনধারার আলোকে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা ও জনজীবনে কেবল অর্থ ও কামকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে তদনুরূপ জীবিকার প্রতিষ্ঠা অর্জনকে 'ধর্ম' নামে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। আজকের ভারতীয় সমাজে আমরা দেখি, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে এবং পাশ্চাত্য ভোগবাদী সংস্কৃতি প্রবেশ করছে। শহরাঞ্চলে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, ব্র্যান্ডেড শোরুমের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মানুষ তার আয়ের একটি বড় অংশ ভোগ্যপণ্যে ব্যয় করছে। বিয়ের অনুষ্ঠান, জন্মদিন, উৎসব—সবকিছুই এখন বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক বন্ধন—সবকিছুরই রূপ বদলাচ্ছে। পাশ্চাত্য জীবনধারার এই প্রভাব এতটাই গভীর যে, মানুষ এখন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, কর্মফল, পুনর্জন্ম—এসব বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ উপার্জন ও তা দিয়ে ভোগ করা। এই মানসিকতা চার্বাক দর্শনের সঙ্গেই বেশি মেলে, বেদান্তের সাথে নয়।

পর্যালোচনার শেষে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হলো—আধুনিক ভোগবাদ এবং প্রাচীন চার্বাক জড়বাদের মধ্যে একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। চার্বাক দর্শন সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল যে, ইহলোকই পরম সত্য এবং ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বহু শতাব্দী পর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ মানুষকে সেই একই সিদ্ধান্তে নিয়ে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

গেছে। পাশ্চাত্য সমাজ তাদের নিজস্ব পথে বস্তুবাদে উপনীত হলেও, তাদের চিন্তার সেই বীজ প্রাচীন ভারতে প্রথম বপন করা হয়েছিল। যদি সরাসরি কার্যকারণ প্রমাণ করা না-ও যায়, তবুও এই সাদৃশ্য এতটাই গভীর যে, আধুনিক ভোগবাদকে চার্বাক দর্শনের একটি "বিবর্তিত রূপ" হিসেবে চিহ্নিত করা সঙ্গত। চার্বাক দর্শনের প্রত্যক্ষবাদ, ইহলোককেন্দ্রিকতা ও সুখবাদ আজকের ভোগবাদী সমাজে নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। নব্য-চার্বাকের মতো, আধুনিক ভোগবাদও তার চরমপন্থা কিছুটা শিথিল করে সব কিছুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে — এমনকি আধ্যাত্মিকতাকেও।

আজকের বিশ্ব যখন ভোগের এই স্রোতে ভাসছে, তখন তার উৎস সন্ধান করতে গেলে ভারতীয় দর্শনের এই জড়বাদী ধারার দিকে তাকাতেই হয়। তাই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার এই অনন্য সাধারণ ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং, একবাক্যে বলা যায়, আধুনিক ভোগবাদ ও চার্বাক জড়বাদ একই সূত্রে গাঁথা, যা মানব মননের এক চিরন্তন দ্বৈত সত্যের প্রকাশ—একদিকে আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে বস্তুবাদ। এই উপলব্ধি আমাদের শুধু ইতিহাস বোঝাতেই সাহায্য করে না, বর্তমান সমাজের গতিপ্রকৃতি বুঝতেও সহায়তা করে। আমরা যদি ভোগবাদের অতিরেকের ফলাফল বুঝতে চাই, তবে আমাদের চার্বাক দর্শনের সুখবাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে। চার্বাক যেমন চরম সুখবাদের পথ দেখিয়েছিল, আবার সেই পথের শেষ সীমানাও নির্দেশ করেছিল। আধুনিক মানুষ যদি চার্বাকের মতো কেবল ইন্দ্রিয়সুখকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে, তবে তার পরিণতি হবে চরম হানিকর ও পরিবেশ হবে ধ্বংস। চার্বাক দর্শনের এই শিক্ষা আজকের ভোগবাদী সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

পরিশেষে বলা যায়, চার্বাক দর্শন ও আধুনিক ভোগবাদের সম্পর্ক একটি চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রকাশ—আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত, ত্যাগ ও ভোগ, সংযম ও আসক্তি। এই দ্বন্দ্বের মাঝেই মানব সভ্যতার যাত্রা, আর এই যাত্রায় চার্বাক এক চিরন্তন সাথী, এক অনন্ত প্রশ্নচিহ্ন।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Chattopadhyaya, D. P. (1977). Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism. New Delhi: People's Publishing House.
Chattopadhyaya, D. P. (1959). Indian Philosophy: A Popular Introduction. New Delhi: People's Publishing House.
Sastri, D.(2013) Charvaka Darshan: Kolkata: West Bengal State Book board
Radhakrishnan, S. (1923). Indian Philosophy (Vol. 1). London: George Allen & Unwin Ltd.
Sharma, C.D (1987). A Critical Survey of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass.
Sarkar, T(2022). Dhrupadi Bharatiya Darshan. Kolkata: Sri Durga Press.
Ghosh, S. (2020). Modernity and Capitalism: India and Europe Compared. Historical Materialism, 28(3), 45-72.
Sharma, A. (2024). Consumerism on the Rise and the Significance of Indian Traditional Values: A Perspective for Change. Philosophical Papers, University of North Bengal, 12(1), 78-95.
Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. (T. Parsons, Trans.). New York: Charles Scribner's Sons.
Sen, A. (2005). The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. London: Allen Lane.
Thapar, R. (2002). Early India: From the Origins to AD 1300. London: Penguin Books.
Basham, A. L. (1954). The Wonder That Was India. London: Sidgwick & Jackson.
Engels, F. (1940). Dialectics of Nature. (C. Dutt, Trans.). New York: International Publishers.
Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon Press.
Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage Publications.
Debord, G. (1967). The Society of the Spectacle. Paris: Buchet-Chastel.